গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(Abstract)

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের সফল যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন বাংলা উপন্যাস জগতে পুরুষ লেখকদেরই আধিপত্য ছিল। উনিশ শতক তো বটেই এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পুরুষ লেখকদেরই প্রাধান্য বজায় ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দুই এবং তিনের দশকে পুরুষ ঔপন্যাসিকদের পাশাপাশি উঠে এলেন নারী ঔপন্যাসিকরা, কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) বাংলার বিদূষী সমাজে, এমনকি, পুরুষ সমাজেও বিদ্যা, শিল্প, জ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তিনি অবলীলাক্রমে পদচারণা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে এসে আরও অনেক মহিলা ঔপন্যাসিককে আমরা পেলাম। জ্যোতির্ময়ী দেবী, সাবিত্রী রায়, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ নারী ঔপন্যাসিকরা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। যদিও বিষয়বস্তু নির্বাচনে গতানুগতিকতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। কারণ সেকালে নারী ছিল অন্তঃপুরবাসিনী এবং অন্তঃপুরচারিণী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল অন্দরমহলের অন্তর্কথা। মূলত বাঙালী সমাজের পারিবারিক কাহিনীই উঠে এসেছিল তাঁদের লেখনীতে।

পরিবারকে কেন্দ্র করে যে বাঙালী সুখী গৃহকোণ, মূলত তাকে আশ্রয় করেই বিংশ শতাব্দীর মহিলা ঔপন্যাসিকরা যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস লক্ষ করা যায় আশাপূর্ণা দেবীর রচনায়। অন্দরমহলের অন্তর-কাহিনীর পাশাপাশি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের তিনি স্থাপন করলেন বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে। পারিবারিক জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে সামাজিক পটভূমিতে স্থাপিত হল নারী। ফলে নারী ঔপন্যাসিকের হাতে নারী চরিত্র এক নতুন পথের সন্ধান পেল। ক্ষুদ্রতা এবং সংকীর্ণতার জটিল আবর্ত থেকে নারীর মানসমুক্তি ঘটল। যে লড়াই শুরু করেছিলেন সত্যবতী তা ছুঁয়ে গেল প্রজন্মের পর প্রজন্মের স্বপ্ন, আকাঙ্খাকে। সত্যবতীর হাত ধরেই অন্দরমহলের নারী বেরিয়ে এল বহির্দুয়ারে।

পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করে বিষয়বস্তু নির্বাচনে মহাশ্বেতা দেবী বৈচিত্র্য আনলেন এবং স্বাতন্ত্র্য দেখালেন। পারিবারিক জীবনের বাইরে সামাজিক সমস্যা,

রাজনৈতিক সংকট এবং ইতিহাসই তাঁর উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গৃহীত হল। যুগপ্রভাব, যুগসংকট এবং যুগযন্ত্রণাকে কোন সচেতন সাহিত্যস্রষ্টা এড়িয়ে যেতে পারেন না। বলা বাহুল্য, মহাশ্বেতাও তা পারেন নি। তাই তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। স্থাপিত হয়েছে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমিতে। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা বললেই আমাদের মনে এক সংগ্রামী কথাকারের ছবি ভেসে ওঠে। তাঁকে নিয়ে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'মহাশ্বেতা দেবী ঃ অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ।' কিন্তু শুধু মাত্র প্রতিবাদের জন্য মহাশ্বেতা কলম ধরেন নি। আসলে এক সমাজ তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সমাজকে দেখেছেন মহাশ্বেতা। তাই তাঁর উপন্যাসে শোষক শ্রেণীর কথা আছে এবং শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রতিবাদের কথা আছে। বিদ্রোহের কথা আছে, উলগুলানের কথা আছে। প্রথম গ্রন্থ 'ঝাঁসির রানি' (১৯৫৬) তে লক্ষ্মীবাঈ - এর ইতিহাস রাজইতিহাস না হয়ে গণইতিহাসে রূপান্তরিত হয় এবং লক্ষ্মীবাঈ সম্পৃক্ত হন গণনায়কে।

পঞ্চাশের দশকের যে তীব্র ফ্যাসিবাদ বিরোধী শিল্পীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন লেখক শিল্পী সমবায়কে কেন্দ্র করে মহাশ্বেতাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আসলে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অঙ্গীকারবদ্ধ। আর মহাশ্বেতা যে সময়ে লেখণী ধারণ করেছেন সে সময় হল স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ। অর্থাৎ পঞ্চাশ-ষাট দশকে দেশ ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদির ফলে উপন্যাসে প্রকাশ পেল জীবন-যাপনের সংকট, মূল্যবোধের বিপর্যয়, ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ-হতাশ-অসহায় বিপর্যস্ত মানুষের নানা দৃশ্যপট। এ সময়ে মহাশ্বেতা প্রত্যক্ষ করেছেন দেশীয় অত্যাচারের কৌশলগুলি আর শাসক দলের ভন্ডামি। ভারতের সাধারণতন্ত্রের জটিল সূত্রগুলি কল্যাণকামী রাষ্ট্র বলে সশব্দে ঘোষণা করলেও সরকার তাকে গ্রাহ্য করে না। অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ বলে ভারতীয় গঠনতন্ত্রের খোঁজও রাখে না। মহাশ্বেতা আরও লক্ষ করেছেন যে মধ্যবিত্তকে তিনি যুদ্ধের পূর্বে পেয়েছিলেন সেই মধ্যবিত্তের চিত্র-চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত। তিনি সেই মধ্যবিত্ত, যিনি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপোষ না করে আরও জঙ্গী হয়ে উঠতে চাইছেন। আসলে মহাশ্বেতা সুদীর্ঘ সময় ধরে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের নানা পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্যক্তি জীবনের নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন হন। দেশ ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সত্তরের দশকের অস্থিরতা, নক্শাল আন্দোলন, বাঙালি জীবনের এই সংকট ও সমস্যাগুলি তাঁর উপন্যাসে নানা ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

মধ্যবিত্ত জীবনের পাশাপাশি আদিবাসী জীবনকে খুঁজলেন ইতিহাসের পটভূমিতে, জীবন

অভিজ্ঞতায়। মহাশ্বেতা একদা মেদিনীপুরে বাসকালে সেখানকার তপশিলী আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর বিহার উড়িষ্যা অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন এবং প্রাথমিক পরিচয় পর্বের পর ক্রমশ তাদের জীবন-যাপনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। জেনেছিলেন তাদের জীবন যাপনের সংকট। তাই স্বেচ্ছাব্রত নিয়েছিলেন এদের উন্নয়ন কর্মে। সেই তপশিলীভুক্ত এবং আদিবাসী সমাজের প্রতি সভ্যসমাজের উন্নাসিক মনোভাব মহাশ্বেতাকে পিড়ীত করেছিল, তাদের প্রতি উপেক্ষা এবং অত্যাচার তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে প্রতি মুহূর্তে। সেই যন্ত্রণারই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেছিলেন নানা অভিযোগ দাখিল করে এবং সমাজকর্ম করে যেহেতু তিনি লেখক তাই তাকে রূপ দিয়েছিলেন লেখ্যকর্মে। মহাশ্বেতার প্রধান কাজ বঞ্চিত, অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে। যাদের তিনি নিজে 'The voiceless section of Indian Society' বলে মনে করেছেন।

বিষয়বস্তু নির্বাচনে মহাশ্বেতা যেমন বৈচিত্র্য এনেছেন তেমনি স্বাতন্ত্র্যও প্রদর্শন করেছেন। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ সব কিছুকেই তিনি গ্রহণ করেছেন অবলীলাক্রমে। প্রথম জীবনের সাহিত্য রচনায় তিনি তাকিয়েছেন ইতিহাসের দিকে। ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। 'ঝাঁসির রানি' উপন্যাসের পটভূমি বুন্দেলখন্ডের রাজপ্রাসাদে। পরবর্তী উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি থাকলেও মূলত তা মোতি আর খুদবক্সের কাহিনী। শিল্পের প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত হয়েছে 'যমুনা-কি-তীর'। 'মধুরে মধুর' উপন্যাসে নৃত্যশিল্পীদেরই পাই আমরা। যার প্রেক্ষাপট আধুনিক সময় — যেখানে আদর্শ শিল্পের সমস্যাকে আবর্তিত করে কাহিনী এগিয়েছে। মহাশ্বেতার উপন্যাসে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব আনতে সার্কাসের দলের কুশীলব থেকে শুরু করে বেদুইনরা এসেছে ভিড় করে। তেমনি অরণ্যের সন্তান বীরসা, চোট্টিরা এসেছে বীরদর্পে। চুয়াড় যুবক কবি বন্দ্যঘটি গাঞি ও ধীর পায়ে প্রবেশ করেছে মহাশ্বেতার উপন্যাসের আঙিনায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মেহনতী মানুষের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত, বিলাসী, অভিজাত শ্রেণী মহাশ্বেতার উপন্যাসে বৈচিত্র্যসাধন করেছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলন, আন্দোলনকারী, শোষক-শাসক শ্রেণীরও অবাধ প্রবেশ ঘটেছে উপন্যাস-ছোটগল্পে। তাই ব্রতী তপনের মায়েরা উপন্যাসে, পরিচিত হয় 'হাজার চুরাশির মা' বা 'মার্ডারারের মা' বলে। আসলে মহাশ্বেতা প্রত্যক্ষ করেছেন সময়ের পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে বদলে যাওয়া মানুষকে। তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে বদলে যাওয়া মানসিকতাকে। তাই নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতার নিরিখে তাদের উপস্থাপিত করেছেন উপন্যাসে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তি পরিচয় ও সাহিত্য পরিচয়

দ্বিতীয় অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের বিষয় ভাবনার অভিমুখ

তৃতীয় অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে জীবনবোধ

চতুর্থ অধ্যায় : মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে সমাজ ভাবনা

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তি পরিচয় ও সাহিত্য পরিচয়

বাংলা কথাসাহিত্যে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব মহাশ্বেতা। অধুনা বাংলাদেশের এক খ্যাতনামা পরিবারে ১৯২৬ সালের ১৪ ই জানুয়ারী মহাশ্বেতা জন্মগ্রহন করেন। মহাশ্বেতা দেবীর পিতা মণীশ ঘটক এবং কাকা ঋত্বিক ঘটক এদেশের সাহিত্য ও চলচ্চিত্র জগতের সর্বজন স্বীকৃত নাম। মাতা ধরিত্রী দেবীও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সমাজসেবাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম পুরোধা নাট্যকার ও অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু ওঁদের দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক পনেরো বছরের বেশী টেকেনি। পরে তিনি অসিত গুপ্তকে বিয়ে করেন। কিন্তু সেই বিয়েও ভেঙ্গে যায় ১৯৭৬ সালে। ব্যক্তি জীবনের এই ঘাত প্রতিঘাত তাঁর সাহিত্য রচনাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং পিতা মণীশ ঘটক এবং স্বামী বিজন ভট্টাচার্য দ্বারা তিনি কতটা প্রভাবিত হয়েছেন। তা আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। ব্যক্তিজীবনের সংগ্রামই যে তাকে সংগ্রামের ইতিবৃত্ত রচনায় উৎসাহিত করেছে তার পরিচয়ও তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। পাশাপাশি তাঁর প্রায় সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির একটি সারণী তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের বিষয় ভাবনার অভিমুখ

এই অধ্যায়ে মহাশ্বেতা দেবীর প্রধান উপন্যাসগুলির যেমন-- 'নটী', 'যমুনা-কি-তীর', 'মধুরে মধুর', 'প্রেমতারা', 'এতটুকু আশা', 'তিমির লগন', 'তারার আঁধার', 'অমৃত সঞ্চয়', 'আঁধারমানিক', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'অরণ্যের অধিকার', 'হাজার চুরাশির মা', 'চোট্টিমুণ্ডা এবং তার তির', 'শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা', 'সরসতিয়া', 'টেরোড্যাকটিল', 'পুরণসহায় ও পিরথা' ইত্যাদি-- বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করে দুটি অভিমুখকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১. ঔপন্যাসিকের জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে উপন্যাসের চরিত্রের জীবনবোধ এবং ২. ঔপন্যাসিকের সমাজ চেতনার নিরিখে উপন্যাসে সমাজ ভাবনার রূপ।

তৃতীয় অধ্যায়
মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে জীবনবোধ

ব্যক্তির শ্রেণী অবস্থান কীভাবে ব্যক্তির জীবনবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। একই ঘটনা দুটি চরিত্রের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জীবনবোধ গড়ে তোলে। যেমন—'হাজার চুরাশির মা' এর সুজাতা এবং সমুর মা একই শোকে শোকার্ত হলেও ভিন্ন ভিন্ন জীবনবোধ দ্বারা চালিত হন। নটী বা লায়লীর মতো চরিত্রে জীবনবোধ কীরকম বা আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিরা কোন জীবনবোধ দ্বারা চালিত হয় তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়
মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে সমাজ ভাবনা

মহাশ্বেতা দেবীর সমাজ ভাবনা কীভাবে বিবর্তিত হয়ে তা উপন্যাস আলোচনার নিরিখে তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাস ও সমাজ, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সমাজ এবং আদিবাসী সমাজ— এই ত্রি-ধারায় সমাজ ভাবনা আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসগুলির আলোচনা করে তাঁর একদিকে নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত জীবনের নানান দিক যেমন উঠে এসেছে তেমনি আদিবাসী সমাজের অন্ধবিশ্বাস সহ নতুন আলোর দিকে যাওয়ার ভাবনাও উঠে এসেছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক বাতাবরণ কীভাবে জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে সেই বোধও ধরা পড়েছে। একদিকে যেমন উপন্যাসগুলির চরিত্রের বোধের মধ্যে লেখিকার জীবনবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তেমনি যে সমাজ উপন্যাসে উঠে এসেছে সেই সমাজের মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর সমাজভাবনা যুক্ত হয়ে রয়েছে। এই অন্বেষণ সমগ্র গবেষণার মধ্য দিয়ে তুলে আনার চেষ্টা রয়েছে।

.... ১১/১০/২০২৭

গবেষকের স্বাক্ষর

.... ১১/১০/২০২৭

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal